International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Volume-II, Issue-I, July 2015, Page No. 77-87
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় বৈষ্ণব ভাব ও ভাবনা

অর্জুন বিশ্বাস
গবেষক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

Vaisnab literature alludes in the innermost part of Rabindranath's literary creation in various ways in various occasions. The relation between Rabindra darshan and vaisnab padabali is always ever green. This very thought and impression that is inherent in his poems and verses is to highlight my subject matter.

রবীন্দ্র-সাহিত্য সৃষ্টির অন্দরমহলে বিভিন্নভাবে ভিন্ন-ভিন্ন প্রসঙ্গে বৈষ্ণব কাব্যকবিতা, গান ও কীর্তনের আনাগোনা দেখা গেছে। রবীন্দ্র কাব্য, কবিতা, গান, গল্প, নাটক, উপন্যাস ও প্রবন্ধে ঘুরে ফিরে আসতে দেখি বৈষ্ণব প্রসঙ্গ। রবীন্দ্রনাথের কবিতার মধ্যে বৈষ্ণব পদাবলী প্রসঙ্গ কিভাবে কেমন করে এসে ভিড় করেছে, আলোচ্য নিবন্ধে তা দেখার চেষ্টা করা হলো। বৈষ্ণব পদাবলীর ভাব ও ভাবনা, ভাষা তরুণ কবি রবীন্দ্রনাথেরও বিশেষ প্রিয় ছিল। রবীন্দ্রনাথের কাব্যকবিতা গল্প নাটক উপন্যাস ও প্রবন্ধের মধ্যে তার যথেষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বৈষ্ণব পদাবলী অনুকরণে তিনি রচনা করেন ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী (১২৯১)। এ সম্পর্কে সমালোচক অজয় কুমার চক্রবর্তী মন্তব্য করেন—

> "বৈষ্ণব কবিতার ভাষা-মাধুর্য, ছন্দ-লালিত্য, তাহার লোকোত্তর মহিমা তরুণ কবির হৃদয় মথিত করিয়াছিল। তাহারই ফলে 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' রচিত হইয়াছিল। ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী রচিত হয় বৈষ্ণব পদাবলীর অনুসরণে এবং ঐ পুস্তকের নামকরণে কবি বিদ্যাপতি ঠাকুরের উপর শ্রদ্ধা ও প্রীতির নিদর্শন বিদ্যমান।"[১]

'ব্রজবুলি' ভাষার অনুকরণ দেখা গেল রবীন্দ্রনাথের 'ভানু সিংহ ঠাকুরের পদাবলী'র প্রথম কবিতার মধ্যেই—

> "গহণ কুসুম কুঞ্জ মাঝে
> মৃদুল মধুর বংশি বাজে,
> বিসরি ত্রাস লোক লাজে
> সজনি, আও আও লো।
> অঙ্গে চারু নীল বাস,
> হৃদয় প্রণয় কুসুম রাশ,
> হরিণ-নেত্রে বিমল হাস,
> কুঞ্জ বনমে আও লো।"[২]

এই পদের সঙ্গে গোবিন্দ দাস কবিরাজের 'শারদচন্দ পবন মন্দ' পদের সুন্দর সাদৃশ্য আছে।

> "শারদ চন্দ পবণ মন্দ
> বিপিনে ভরল কুসুম গন্ধ
> ফুল্ল মল্লিকা মালতি যূথি
> মত্ত-মধুকর ভোরণি।"[৩]

বৈষ্ণব পদাবলীর ধারক ও বাহক জয়দেব গোস্বামীর 'গীতগোবিন্দ' সব থেকে বেশী করে পাঠ করতেন এবং বালক কালের ভালোলাগার বিষয় ছিল রবীন্দ্রনাথের। জয়দেবের ভাব-ভাষা ও ছন্দ যে শুধু কিশোর কবি রবীন্দ্রনাথকেই মুগ্ধ করেছিল তা নয়, পরিণত রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করেছিল। তাই দেখা যায় জয়দেবের–

"রতি সুখ সারে গতমভিসারে
মদন মনোহর-বেশম।
নকুরু নিতম্বিণি গমন বিলম্বন
মনুসর তং হৃদয়েশম্।।"[৪]

এই পদের প্রতিধ্বনি রবীন্দ্রনাথের ভানুসিংহে প্রতিফলতি হয় এইভাবে–

"সতিমির রজনী সচকিত সজনী
শূন্য নিকঞ্জ অরণ্য।
কলয়তি মলয়ে, সুবিজন নিলয়ে
বালা বিরহ বিষন্ন।।"[৫]

কিংবা ভানুসিংহের–

"বসন্ত আওলরে!
মধুকর গুণ গুণ, অনুয়া মঞ্জরী
কানন ছাত্তল রে।"[৬]

এই পদের ধ্বনিঝংকার অনুকরণ ও অনুসরণ হয় বিদ্যাপতির এই পদটিতে–

"ফুটল কুসুম নব কুঞ্জকুটির বন
কোকিল পঞ্চম গাওইরে।...
পিয়া নিজ দেস না আওই রে।"[৭]

রবীন্দ্রনাথ ভানুসিংহের পদাবলীতে ভণিতা ব্যবহারের ক্ষেত্রে বৈষ্ণব কবিদের ও বৈষ্ণব পদের ঢং অনুসরণ করেছেন। গোবিন্দ দাসের পদে যে মঞ্জুরী ভাবের ভণিতা দেখা যায় তা ভানুসিংহের পদেও দেখা যায়–

"নদী-মগন মহী, ভয় ডর কিছু নাহি,
ভানু চলে তব সাথ।"[৮]

বৈষ্ণব 'ব্রজবুলি' কবিতার সঙ্গে ভানুসিংহ ঠাকুরের পদের বহিরঙ্গের মিল বেশ গভীর। গভীর ভাবে না পড়লে ও ভাবলে এই সাদৃশ্য সহজে ধরা যায় না কারণ–

> "যেহেতু ব্রজবুলি একটি কৃত্রিম ভাষা, তাই প্রাচীন পদকর্তার বলে ভানুসিংহের কবিতার ভাষাকেও চালিয়ে দেওয়া অসম্ভব নয়; - একথা স্বীকার করেও পদগুলির ভাবের গভীরতা ও খাঁটিত্ব সম্পর্কে নিজেই অভিযোগ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। বৈষ্ণব পদাবলীর 'প্রাণ গলানো ঢালা সুর' হয়তো এতে নেই, তা হলেও ধ্বনি সৌন্দর্য, গীতঝঙ্কার, বাহ্যরূপাবয়বের উৎকর্ষে ভানুসিংহের পদাবলী সমসাময়িককালে রচিত আর সব রবীন্দ্র কবিতার চেয়ে অনেক উঁচুদরের।"[৯]

রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ প্রশান্ত কুমার পাল তাঁর 'রবিজীবনী' গ্রন্থের পাদটীকাতে চন্দ্রনাথ বসুর একটি সুন্দর মন্তব্য তুলে ধরেন–

> *"The sentiment of love is expressed in these sonnets in forms which are at once so deep, delicate, tine, fervid and in verses so full of the luxuriance of Music and Melody that it is difficult to decide who the better sonneteer the imitator Bhanusinha Thakur is, or his Model the great Baisnaba poet."*[১০]

বৈষ্ণব পদাবলী ও ভানুসিংহের কবিতা একই রকম হলেও ভাষার ক্ষেত্রে যথেষ্ট স্বাধীনতা গ্রহণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ আর এই কারণে ভানুসিংহের পদগুলি ব্রজবুলির হুবহু অনুকরণ হয়ে উঠতে পারেনি। আসলে বৈষ্ণব পদাবলী ও ভানুসিংহের পদাবলীর প্রভাবিত সম্পর্ক হল এই রকম–

> "ধ্বনির সহিত প্রতিধ্বনির যে সম্পর্ক বৈষ্ণব কবিতার সহিত 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'র সম্পর্ক তাহা হইতে কিছু বেশী নহে।"[১১]

সুতরাং রবীন্দ্র অনুভব বৈষ্ণব অনুভব থেকে মৌলিক ভাবেই আলাদা। আর আলাদা বলেই রাধাকৃষ্ণলীলার রসতত্ত্বের আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ না করেও বৈষ্ণব ভাব প্রেরণাকে রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করে নিয়েছিলেন স্বাভাবিক প্রবণতায়। নিজের কবিকল্পনায় উপনিষদ এবং বৈষব পদাবলীর সাহিত্য ধর্মের দ্বারা তিনি প্রভাবিত ঠিক হননি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। আর অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন বলেই তাঁর কাব্য ধর্মীয় বাতাবরণকে ছিন্ন করে সাহিত্য হতে পেরেছিল; ধর্মীয় সাহিত্য নয়। বৈষ্ণব অনুভবের রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়লীলা সীমার সঙ্গে অসীমের প্রণয়লীলা। কৃষ্ণ প্রেমিকা রাধা মহাবিশ্ব জীবনের প্রতিনিধি এবং কৃষ্ণ আনন্দময় পরমাত্মার পরমপুরুষ। এই মহাবিশ্ব ও অসীমের সত্য সম্বন্ধটি রবীন্দ্রনাথ ‘গীতাঞ্জলী’ কাব্যে সুন্দরভাবে প্রকাশ করলেন। সীমা ও অসীমের মিলন বার্তা দিলেন–

> “সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর
> আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাইত এত মধুর।
> কতবর্ণে কত গন্ধে, কত গাণে কত ছন্দে
> অরূপ তোমার রূপের লীলায় জাগে হৃদয়পুর
> আমার মধ্যে তোমার শোভা এমন সুমধুর।।”[১২]

এই যে রূপের সঙ্গে অরূপের মিলন অর্থাৎ জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলন সংঘটিত হচ্ছে; এতে অনেকগুলি ধাপ অতিক্রম করতে হয়। এই ধাপগুলি বৈষ্ণবীয় ভাষাতে পূর্বরাগ, অনুরাগ, মান অভিমান, অভিসার, বিরহ মিলন প্রভৃতি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বৈষ্ণব কবিতায়’ বিষয়টি সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন–

> “পূর্ব্বরাগ, অনুরাগ, মান, অভিমান,
> অভিসার, প্রেমলীলা, বিরহ মিলন,
> বৃন্দাবন গাথা-এই প্রণয় স্বপন
> শ্রবণের শর্বরীতে কালিন্দীর কূলে
> চারি চক্ষের চেয়ে দেখা কদম্বের মূলে
> শরমে সম্ভ্রমে”[১৩]

কবির কাছে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমচ্ছবি ধরা পড়েছে; যে প্রেম চিরন্তনকালের শাশ্বতপ্রেম; যে প্রেম অগ্রসর হয় দুর্গম দুস্তর পারাবার অতিক্রমের মধ্য দিয়ে। এই কারণেই রবীন্দ্র অনুভব ও বৈষ্ণব অনুভবে মৌলিক পার্থক্য থেকেই যায়। তাই প্রভাবের কোন প্রশ্ন ওঠে না; প্রশ্ন ওঠে অনুপ্রেরণার বা অনুপ্রাণিত হওয়ার। এই কারণেই হয়তো ‘বৈষ্ণব রস প্রকাশ’কার ক্ষুদিরাম দাস মন্তব্য করেছেন–

> “সুতরাং রবীন্দ্র অনুভব বৈষ্ণব অনুভব থেকে মৌলিকভাবে পৃথক। এরকম ক্ষেত্রে প্রভাবের প্রশ্ন ওঠে না। রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণবধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হননি। পদাবলীর সাহিত্যধর্মের দ্বারা তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, ভাষা-ভঙ্গি চিত্রকল্পও গ্রহণ করেছেন স্বচ্ছন্দে, যেমন গ্রহণ করেছেন কীর্তন গানের সুর নানান ক্ষেত্রে। সম্ভবত রবীন্দ্র পদাবলীর ভাষা ও রূপকল্প স্থানে স্থানে গ্রহণ করেছেন বলেই পাঠকের চোখে ধাঁধা লেগেছে, অন্তরঙ্গ ভাব সম্পর্কেও তাঁরা সাজাত্য ধরে নিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের পদাবলী প্রীতি ছিল, কিন্তু তা সাহিত্যিক, ধর্মীয় নয়। সাহিত্যিক দিকের অনুসরণ ঐতিহ্য হিসাবেই তাঁতে বর্তেছিল।”[১৪]

বৈষ্ণব পদাবলীর ভাব-ভাষা-সুর-ছন্দ ও রূপকল্পনা রবীন্দ্রনাথের কবি জীবনে ও রবীন্দ্র কবিতার দেহ গঠনে কতটা ভূমিকা রেখেছে তা বিচার করবো। রবীন্দ্র কবিতার দেহমনে ভানুসিংহের পদাবলী ছাড়াও অন্যান্য কাব্যকবিতার মধ্যে বৈষ্ণব পদাবলীর সৌন্দর্য চিত্র ও ‘ত্বপ্সস্তুন্দ্বপ্ত’ এর অনুসরণ দেখা যায়। ‘ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী’তে যা ছিল ‘সীমা’ পরবর্তীকালে তা হয়ে দাঁড়ালো অসীম। এই কারণেই হয়তো রবীন্দ্র গবেষক বিশ্বনাথ রায় বলেছেন–

> “পরবর্তী কালের রবীন্দ্র কবিতার দেহে মনে প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষ যেভাবেই হোক না কেন, বৈষ্ণব পদাবলীর ভাষা ভাব সুর ছন্দ রূপকল্প নানা প্রকরণে মিশে যেতে পেরেছে, আজীবন শুধু সচেতন মনেই নয় অবচেতনাতেও বৈষ্ণব ভাবুকতাকে এক মুহূর্তের জন্য পরিহার করতে পারেননি রবীন্দ্রনাথ।”[১৫]

১২৯২ সালে শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ও রবীন্দ্রনাথ উভয়ে মিলে বৈষ্ণবপদ সংকলন ‘পদরত্নাবলী’ প্রকাশ করেন। এই সময়ই বৈষ্ণব কবিতা চর্চায় গভীর মনোযোগ দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ফলে এই সময়ে লেখা ‘কড়ি ও কোমল’ (১২৯০-৯৩) কাব্য গ্রন্থের বহুকবিতায় বৈষ্ণব পদাবলীর মানসিকতার প্রত্যক্ষ প্রভাব দেখা গেল। মাথুর বিরহে রাধার যন্ত্রণার কথা বেশী বেশী করে

ধরা পড়ে বৈষ্ণব কবিদের পদের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথের 'মথুরায়' কবিতায় কৃষ্ণবিরহ যন্ত্রণা সুন্দর ভাবে প্রকাশ করেছেন। কৃষ্ণ বিরহে রাধাকে ডাকছেন—

"বাঁশারি বাজাতে চাহি বাঁশরি বাজিল কই?...
এবার রাধে রাধে ডাক্ বাঁশি মনোসাধে,
আজি এ মধুর চাঁদে মধুর যামিনী ভায়।
কোথা সে বিধুরা বালা, মলিন মালতী মালা,
হৃদয়ে বিরহ জ্বালা, এ নিশি পোহায়, হায়।"[১৬]

বৈষ্ণব পদাবলী মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ প্রেমের কবিতা। ধর্মীয় আধ্যাত্মিক পরিবেশকে বাদ দিলে; ধর্মীয় পোশাক খুলে নিলে বৈষ্ণব কবিদের রচনা নিছকই প্রেম বিরহ যন্ত্রণার কবিতা। এই বিষয়টি রবীন্দ্রনাথ আত্মস্থ করতে পেরেছিলেন মনের দিক থেকেই ফলে তাঁর নিজের প্রেমের কবিতাগুলি হয়ে উঠেছিল বৈচিত্র্যময় বৈষ্ণবময়তায় ভরপুর। 'কড়ি ও কোমলে'র বাঁশি, বিরহ, বিলাপ প্রভৃতি কবিতা বৈষ্ণবপদাবলীর অবিরাম ছোঁয়া পেয়েছে রাধা কৃষ্ণলীলার বিরহযন্ত্রণার কোমল স্পর্শ। জ্ঞানদাসের—

"শেজ বিছাইয়া রহিলুঁ বসিয়া
পথ পানে নিরখিয়া..."[১৭]

এই পদের সঙ্গে 'বিরহ' কবিতার ভীষণ মিল লক্ষ্য করা যায়—

"আমি নিশি নিশি কত রচিব শয়ণ
আকুল নয়ন রে..."[১৮]

কিংবা 'বিলাপ' কবিতার মধ্যে এই বিরহব্যথা আরো প্রভাব বিস্তার করেছে বলেই আমাদের মনে হয়—

"আর নিয়ে যা রাধার বিরহের ভার
কত আর ঢেকে রাখি বল
আর পারিস যদি তো আনিস হরিয়ে
এক ফোঁটা তার আঁখিজল।"[১৯]

এ তো রাধাবিরহের আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক রূপ যা রবীন্দ্রনাথ তাঁর কলমে অঙ্কন করতে পেরেছেন।

বৈষ্ণব পদাবলী প্রভাবিত রাধাবিরহ সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন 'পুরাতন' কবিতার মধ্যেও। রবীন্দ্রনাথের 'পুরাতন' কবিতার ভাব-ভাষা বিদ্যাপতির ভাবমণ্ডল থেকে ধার করা বলেই আমাদের মনে হয়। কৃষ্ণের বাঁশি শুনে বিরহ-ব্যাকুল রাধার অশ্রুপাত। বিদ্যাপতির রাধার অশ্রুপাতের কারণ জানতে চায় সখিরা, তখন রাধা বলেন-

"কি কহব রে সখি ইহ দুখ ওর
বাঁশির নিশাস-গরলে অনু ভোর।"[২০]

রাধা বিরহাতুরা ভাবই রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরলেন-

"সুদূরে বাজিছে বাঁশি, তুমি কেন ঢাল আসি
তারি মাঝে বিলাপ উচ্ছ্বাস!...
বারেক যে চলে যায় তারে তো কেহ না চায়,
তবু তার কেন এত মায়া!..."[২১]

'যৌবন স্বপ্ন', 'ক্ষণিক মিলন', 'গীতোচ্ছ্বাস', 'চুম্বন' প্রভৃতি কবিতায় রাধা-কৃষ্ণের বিরহমিলনের অনুষঙ্গে কবির নিজের হৃদয় উচ্ছ্বসিত মানসিকতাই প্রকাশ পেয়েছে। কোন কোন কবিতা 'যৌবন উত্তাপে' দেহকেন্দ্রিক হয়েও দেহকে অতিক্রম করে দেহাতীত হয়ে উঠেছে। 'দেহের মিলন' কবিতাটি সেই দিক থেকে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রত্যক্ষ প্রভাব চূড়ান্তভাবে এসে পড়েছে। জ্ঞানদাসের বিশ্ববিখ্যাত পদটি—

"রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।"[২২]

এর ভাবও ভাষার সচেতন অনুসরণ লক্ষ্য করা গেল রবীন্দ্রনাথের এই পদটিতে—

"প্রতি অঙ্গ কাঁদে তব প্রতি অঙ্গ তরে।
প্রাণের মিলন মাগে দেহের মিলন

হৃদয়ে আচ্ছন্ন দেহ হৃদয়ের ভরে।
মুরছি পড়িতে চায় তব দেহ' পরে।..."[২৩]

কবিতাটির ভাবানুসঙ্গের দিকে লক্ষ্য রেখে সমালোচক বিশ্বনাথ রায় সুন্দর মন্তব্য করেছেন—

"কবিতাটিতে রাধা হৃদয়ের ব্যাকুলতা ইন্দ্রিয়জভাবের উর্ধ্বে উঠে ক্রমশ এক অতীন্দ্রিয় লোকে প্রবেশ করেছে। রসতত্ত্বের বিচারে বৈষ্ণব ভাবের অনুকূল না হলেও জ্ঞান দাসের পদের পাঠ প্রতিক্রিয়ায় নব মূল্যায়ন ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের হাতে। বস্তুত বৈষ্ণব পদাবলীর বা জয়দেবের কাব্যে রাধা-কৃষ্ণের দেহচর্চার যে ছবি, তার কোনো প্রত্যক্ষ সংযোগের চিহ্নই রবীন্দ্র কবিতায় নেই। দেহচর্চা নয়, রবীন্দ্রনাথের আন্তরিক মনোযোগ ছিল সংযমী রসচর্চার দিকে।"[২৪]

বৈষ্ণব পদাবলীর সুখদুঃখ বিরহ বেদনার গোপন অনুভব রবীন্দ্র অনুধ্যানে ও অনুসরণে আপনা আপনিই যেন চলে আসে। বৈষ্ণব পদাবলীর প্রেম বৈচিত্ত্যের ভাবনা ধরা পড়তে দেখি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে। চণ্ডী দাসের—

"এমন পিরীতি কভু দেখি
নাই শুনি।
পরাণে পরাণ বাঁধা আপনা আপনি।।
দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
তিল আধ না দেখিলে যায় যে মরিয়া।।"[২৫]

এই ক্ষীণ সুর হৃদয়ে স্পর্শ করে যায় কবির; ফলে কবি 'মানসী'র 'পূর্ব কালে' কবিতা বলে ওঠেন—

"অনাদি বিরহ বেদনা ভেদিয়া
ফুটেছে প্রেমের সুখ
যেমনি আজিকে দেখেছি তোমার মুখ।
সে অসীম ব্যথা অসীম সুখের
হৃদয়ে হৃদয়ে রহে,
তাই তো আমার মিলনের মাঝে
নয়নে সলিল বহে।
এ প্রেম আমার সুখ নহে, দুখ নহে।"[২৬]

বৈষ্ণব পদাবলীর মূলবাণী প্রেমপ্রীতি ভালোবাসা; যে প্রেম অনন্ত আদি প্রেম যা দিয়ে আমরা ভগবানকে ভালোবাসি। আমরা যাকে ভালোবাসি কেবল তার মধ্যেই আমরা অনন্তের পরিচয় পাই। জীবের মধ্যে এই অনন্তকে অনুভব করার নামই ভালোবাসা যা বৈষ্ণব সাহিত্যের মূল 'থিম'। রাধাকৃষ্ণের প্রেম বৈষ্ণব সাহিত্যে জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলন যা রবীন্দ্রনাথ 'অনন্ত প্রেম' কবিতাতে দেখালেন এই ভাবে—

"তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি
শত রূপে শত বার
জনমে জনমে, যুগে যুগে অনিবার।...
... আমরা দু'জনে ভাসিয়া এসেছি
যুগল প্রেমের স্রোতে
অনাদিকালের হৃদয় উৎস হতে।"[২৭]

রাধার ভালোবাসা কত গভীর ও নিখুঁত তা বোঝাতে শ্রীকৃষ্ণকে রাধা বলেন—

"বঁধু কি আর বলিব তোরে
অল্প বয়সে পিরীতি করিয়া
রহিতে না দিলি ঘরে।"[২৮]

চণ্ডীদাসের এই পদের প্রতিধ্বনি ও প্রতিছবি আমরা দেখে থাকি রবীন্দ্রনাথের 'আমার সুখ' কবিতার মধ্যে—

"ভালোবাসা ঘেরা ঘরে কোমল শয়নে তুমি
যে সুখেই থাকো

যে মাধুরী এ জীবনে আমি পাইয়াছি তাহা
তুমি পেলে নাকো।"[২৯]

বৈষ্ণব পদাবলীর প্রেম ও প্রকৃতি বর্ণনার যে ধরণ তা ধীরে ধীরে কবির মনে দানা বেঁধেছিল নিজস্ব style-এ, ফলে মধ্যযুগের বৈষ্ণবীয় সাহিত্যের বক্তব্য বিষয় নতুনভবে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে নবমূল্যায়ণ করলেন রবীন্দ্রনাথ 'মানসী'র 'একাল ও সেকাল' কবিতার মধ্যে—

"আজও আছে বৃন্দাবন মানবের মনে।
শরতের পূর্ণিমায়
শ্রবণের বরিষায়
উঠে বিরহের গাথা বনে উপবনে।
এখন যে বাঁশি বাজে যমুনার তীরে।
এখনো প্রেমের খেলা
সারাদিন, সারা বেলা
এখনো কাঁদিছে রাধা হৃদয় কুটিরে।"[৩০]

কবিতাটি কৃষ্ণ-পাগলিনী রাধিকার স্মৃতিভারাতুর চিত্র স্মরণ করিয়ে দেয় আমাদের মনের মনিকোঠরে। এই কারণেই সমালোচক বলেন—

"সেকালের বৈষ্ণব কবিদের রচনার রসমাধুর্য একালে বসে মর্মে মর্মে আস্বাদন করেছেন রবীন্দ্রনাথ। সেকালের *Author* সত্তার মাধ্যমে *Author* রবীন্দ্রনাথ এই ভাবেই বারে বারে *'Real writer'* হয়ে উঠেছেন পদাবলীর অনুষঙ্গে বিচিত্রভাবে।"[৩১]

বৈষ্ণব পদাবলীর ভাব ভাষা মাধুর্যের চরম উৎকর্ষের প্রভাব দেখা যায় 'সোনার তরী' কাব্যের বহু কবিতার মধ্যে। বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের প্রেম সৌন্দর্যের শাশ্বত রহস্যকে অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেছেন এই কাব্যের মধ্যে। বৈষ্ণব কবিদের কাব্য কবিতার কথা, তাঁদের চিন্তাভাবনার কথা রবীন্দ্রনাথের মাথায় ঘুরে ফিরে এসেছে বারে বারে। বর্ষার বিচিত্র ঋতু প্রকৃতির সঙ্গে বৈষ্ণব কবিতার যে গভীর সম্পর্ক সে কথা স্বীকার করেন তিনি। রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষাযাপন' কবিতার মধ্যে ধরা পড়ে কবির বৈষ্ণবীয় মনস্তত্ত্ব—

"বর্ষা আসে ঘন রোলে, যত্নে টেনে লই কোলে
গোবিন্দদাসের পদাবলী।
সুর করে বার বার পড়ি বর্ষা-অভিসার—
অন্ধকার যমুনার তীর,
নিশীথে নবীনা রাধা নাহি মানে কোনো বাধা
খুঁজিতেছে নিকুঞ্জ কুটির।...
সেই ছবি জাগে মনে পুরাতন বৃন্দাবনে
রাধিকার নির্জন স্বপন।"[৩২]

বৈষ্ণব পদাবলী যে রবীন্দ্রনাথকে সর্বদা টানত তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'; বিদ্যাপতি ও গোবিন্দ দাসের পদাবলী সুর করে করে বারে বারে পাঠ করার মধ্য দিয়ে। রবীন্দ্রনাথ শুধু তাঁর কবিতার মধ্যেই নয়, বিভিন্ন প্রবন্ধ, উপন্যাস ও নাটক, গল্পের মধ্যেও বৈষ্ণব পদাবলীর পদ ও অনুসঙ্গ বার বার ব্যবহার করেছেন। বৈষ্ণব সাহিত্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই গভীর আত্মীয়তার বহিঃপ্রকাশ 'ব্যর্থযৌবন', 'প্রত্যাখ্যান' ও 'লজ্জা' কবিতার মধ্যে। বৈষ্ণব পদাবলীর রাধার অনুভাবনার বিরহ ব্যাকুল অনুভূতি আরো তীব্র ভাবে প্রকাশ পেল 'ব্যর্থ যৌবন' কবিতার মধ্যে—

"আজি যে রজনী যায় ফিরাইব তা
কেমনে?"[৩৩]

রাধার বিরহ মধুর প্রতিচ্ছবির এই বিনির্মাণ দেখে সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন—

"বৈষ্ণব কবিতার রাধার মতো আপনাকে বিরহিনী নারী রূপে কল্পনা প্রথম দেখা গেল 'ব্যর্থ যৌবন' কবিতায়। অতএব এই কবিতাটিকে রবীন্দ্রনাথের কাব্যসরণিতে একটি মার্গ চিহ্ন বলিতে পারি।"[৩৪]

আবার চণ্ডী দাসের—

"সই কেমনে ধরিব হিয়া।
আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায়
আমার আঙ্গিনা দিয়া।।"[৩৫]

এই পদটির পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের 'প্রত্যাখ্যান' কবিতার রাধাভাবের অনুসরণ যেন জীবন্ত মূর্তি হয়ে দাঁড়ায়—

"সকাল বেলা সকল কাজে
আসিতে যেতে পথের মাঝে
আমারি এই আঙ্গিনা দিয়ে
যেয়ো না।
অমন দীন নয়নে তুমি
চেয়ো না।..."[৩৬]

বৈষ্ণব পদাবলীর চিত্র সৌন্দর্য, ভাব-ভাষা, কল্প ও রূপচিত্রের সমস্ত কিছুরই প্রভাব ও অনুপ্রেরণা ছড়িয়ে যায় 'সোনার তরীর' 'বৈষ্ণব' কবিতায়। বৈষ্ণব ধর্মকে নিয়েই বৈষ্ণব সাহিত্য, তাকে বাদ দিয়ে নয়, ফলে বৈষ্ণব ভক্ত পাঠকের চোখে প্রকৃত প্রেমের দিকটা যত বেশি ধরা পড়েছে, ধর্ম দর্শন বা অলৌকিক ভক্তিরস ততটা বেশী ধরা পড়ে না। বৈষ্ণব পদাবলী শুধুমাত্র দেবতার সংগীত নয়, মানবজীবনের কাহিনীর বহিঃপ্রকাশও বটে। কারণ সকল মহাজনপদাবলীকার গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রেক্ষাপটে পদরচনা করেননি। চৈতন্য পূর্ব কালে জয়দেব-বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস তার জ্বলন্ত প্রমাণ। রাধা কৃষ্ণের প্রেমলীলাই তাদের প্রধান কাব্য প্রতিবিম্ব। চৈতন্য পরবর্তীকালে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের বাতাবরণে জ্ঞান দাস, গোবিন্দ দাস, বলরাম দাস, রায়শেখর প্রমুখ বৈষ্ণব পদাবলীকাররা তাঁদের ব্যক্তিগত প্রেমভাবনা কবিমনের অবচেতন অবস্থাতেই প্রকাশ করেছেন। ফলে—

> "প্রাকচৈতন্য যুগের 'প্রেয়' মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে 'শ্রেয়'-তে উড্ডীন হইয়া প্রিয় ও দেবতা একই ধারায় প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে।"[৩৭]

তাই বৈষ্ণব পদাবলীর অতীন্দ্রিয় প্রেমকল্পনার মধ্যে মানব মানবীর চিরন্তন প্রেমলীলাকেই প্রত্যক্ষ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। পদাবলীর প্রকৃতিচেতনা তাঁর সৌন্দর্যব্যাকুল কবিমানসকে উতলা করলেও ধর্মীয় সংস্কারের গণ্ডী কিন্তু কবিমনে প্রশ্ন এঁকে দেয়-পার্থিব প্রেম এবং ব্রজপ্রেম কি একই বস্তু? এই কারণেই রবীন্দ্রনাথের অভিমানী প্রতিবাদ "শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান।" না আরো বেশী কিছু। আসলে বৈষ্ণবের গান শুধুমাত্র দেবতার গান নয়, মর্ত্যবাসী নরনারীর প্রেমতৃষ্ণার গানও বটে। তাই কবি বললেন—

"...একি শুধু দেবতার!
এ সংগীত রসধারা নহে মিটিবার
দীন মর্ত্যবাসী এই নরনারীদের
প্রতি রজনীর আর প্রতি দিবসের
তপ্ত প্রেমতৃষ্ণা?"[৩৮]

মর্ত্যের মানব মানবীর প্রেমগাথাই কবিভাবনার অপ্রাকৃত প্রেমসাধনার আসল রূপ। তাই আধুনিক কবি মানুষীপ্রেমের মধ্যেই ভগবানের প্রেমকে উপলব্ধি করেছেন। সীমার মধ্যেই অসীমকে সন্ধান করেছেন কিংবা জীবন ধর্মের আন্তর সত্য প্রকাশের জন্য 'প্রেয়' পবিত্র স্বরূপের মধ্যে 'শ্রেয়' কে খুঁজেছেন। অপ্রাকৃত প্রেমের এই গভীর রহস্যের অনুসন্ধান করতে গিয়ে বৈষ্ণব কবিদের কাছে আধুনিক কবি জানতে চেয়েছেন—

"সত্য করে কহ মোরে হে বৈষ্ণব কবি,
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি,
কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান
বিরহ তাপিত। হেরে কাহার নয়ান,
রাধিকার অশ্রু-আঁখি পড়েছিল মনে।...
... এত প্রেমকথা –
রাধিকার চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা
চুরি করি লইয়াছে কার মুখ, কার

আঁখি হতে! আজ তার নাহি অধিকার
সে সংগীতে! তারি নারী হৃদয় সঞ্চিত
তার ভাষা হতে তারে কবিরে বঞ্চিত
চিরদিন!"[৩৯]

মানবের মধ্যে দেবতার বাসস্থান-এই সত্যকে রবীন্দ্রনাথ ভুলতে পারেন না। সেই কারণে মানুষের মধ্যে দেবতাকে নামিয়ে আনতে পেরেছিলেন। আর বৈষ্ণব কবিরা তো অনেক আগেই এ কাজ সম্পূর্ণ করে রেখেছিলেন। চৈতন্যদেব তার জ্বলন্ত উদাহরণ। বৈষ্ণব কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাই বললেন—

"কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাহার স্বরূপ।
...নবলীলা হয় অনুরূপ।"[৪০]

আধুনিক কবি রবীন্দ্রনাথ এই সুরে সুর মিলিয়ে নতুন ভাষ্য রচনা করলেন—

"...এই প্রেম গীতি হার
গাঁথা হয় নরনারীর মিলন মেলায়,
কেহ দেয় তাঁরে কেহ বঁধুর গলায়।
দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে-প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে; আর পাব কোথা।
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।"[৪১]

'চিত্রা' কাব্যের 'শীতে ও বসন্তে' এবং 'চৈতালি' কাব্যের 'অভিমান' কবিতায় বৈষ্ণবপদাবলীর ভাব ও ভাষার প্রভাব অল্পসল্প লক্ষ্য করা যায়।

আবার চৈতালী কাব্যের 'অভিমান' কবিতার—

"কারে দিব দোষ বন্ধু কারে দিব দোষ।
বৃথা কর আস্ফালন, বৃথা কর রোষ।।"[৪২]

বহিরঙ্গীয় অনুসরণ করেন প্রাকচৈতন্য যুগের শ্রেষ্ঠ পদকার চণ্ডীদাসের সেই বিখ্যাত লাইন দুটির—

"কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন।"[৪৩]

'কল্পনা' কাব্যের বেশ কিছু কবিতাও বৈষ্ণবপদাবলীর প্রত্যক্ষ উপাদানে গঠিত হতে দেখা যায়। 'কল্পনা' কাব্যের 'স্পর্ধা' কবিতার নায়িকার সঙ্গে জ্ঞানদাস ও গোবিন্দ দাসের নায়িকার প্রায় মিল দেখা যায়। শ্রীরাধার রসোদ্‌গারের সাদৃশ্য ফুটে উঠতে দেখি 'স্পর্ধা' কবিতার নায়িকার মধ্যে। আধুনিক কবির নায়িকা তাই লাজুক লাজুক কণ্ঠে বলে ওঠেন—

সে আসি কহিল, 'প্রিয়ে মুখ তুলে চাও।'
দুষিয়া তাহারে রুষিয়া কহিনু 'যাও!'
সখী ওলো সখী, সত্য করিয়া বলি,
তবু সে গেলনা চলি।"[৪৪]

তখন কি আমাদের মনে পড়ে যায় না জ্ঞানদাসের নায়িকার সকরুন উক্তি—

"যব কানু আওল মন্দির মাঝে।
আঁচরে বদন ঝাঁপায়লু লাজে।।"[৪৫]

কিংবা গোবিন্দ দাসের—

"এই না মাধবী তলে আমার লাগিয়া পিয়া
যোগী যেন সদাই ধেয়ায়।
পিয়া বিনে হিয়া কেনে ফাটিয়া না পড়ে গো
নিলাজ পরাণ নাহি যায়।"[৪৬]

-এই পদের ভাবগত সাদৃশ্যের কথা বলা যায়।

আবার রবীন্দ্রনাথের 'পসারিনী' কবিতার ভাবগত উৎস বংশীবদনের একটি বৈষ্ণব পদ। বংশীবদন তাঁর বৈষ্ণবপদে রাধা বিনোদিনীর পরিশ্রান্ত মূর্তি অঙ্কন করলেন এই ভাবে—

"হেদে লো বিনোদিনি
এপথে কেমনে যাবে তুমি।
শীতল কদম্বতলে বৈসহ আমার বোলে
সকলি কিনিয়া নিব আমি।"[৪৭]

এই পদটির অনুপ্রেরণায় আধুনিক কবি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে লিখেলেন—

"ওগো পসারিনী, দেখি আয়
কী রয়েছে তব পসরায়।
এত ভার মরি মরি কেমনে রয়েছে ধরি
কোমল করুণ ক্লান্তকায়!"[৪৮]

কিংবা 'কল্পনার' 'লজ্জিতা' কবিতায় রাধা-কৃষ্ণের কুঞ্জ ভঙ্গের ছবি ধরা পড়ে। রবীন্দ্রনাথ গোবিন্দদাস, বলরামদাস, বসুরামানন্দের বৈষ্ণব পদগুলির 'কুঞ্জভঙ্গ' পর্যায়ের পদগুলি মাথায় রেখেই 'লজ্জিতা' কবিতার ছাঁদ তৈরী করেন। 'লজ্জিতা' কবিতার রাধার কুঞ্জভঙ্গের ছবি লক্ষ্য করেই রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করেন—

"একেবারে বৈষ্ণবীয় গান, গীতগোবিন্দের কুঞ্জ হইতে নির্গতা রাধার কথা।"[৪৯]

বৈষ্ণব ভাবানুষঙ্গে রাধার কুঞ্জভঙ্গের ছায়া চিত্রের সুন্দর প্রকাশ—

"যামিনী না যেতে জাগালে না কেন,
বেলা হল মরি লাজে!
শরমে জড়িত চরণে কেমনে
চলিব পথের মাঝে!..."[৫০]

আধুনিক কবি এই প্রতিচ্ছবি পেয়েছিলেন মধ্যযুগের বৈষ্ণব কবিদের বৈষ্ণব পদের মধ্যে।

'কল্পনা' কাব্যের তুলনায় 'ক্ষণিকা'র কবিতাগুলির মধ্যে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রত্যক্ষ প্রভব খুবই কম। 'ক্ষণিকা'র 'জন্মান্তর' কবিতা বৈষ্ণব পদাবলীর ভাবচিত্রের ক্ষণিক স্পর্শ লক্ষ্য করা যায়। সমগ্র কবিতাটিতে ব্রজধামের মাধুর্যমণ্ডিত রাখাল বালক কৃষ্ণের বন্দনা দেখা যায়। ব্রজরাখাল কৃষ্ণের বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ একালের বৈষ্ণব কবি হয়ে উঠেছেন—

"যদি পরজন্মে পাই রে হতে
ব্রজের রাখাল বালক...
যারা নিত্য কেবল ধেনু চরায়
বংশীবটের তলে,
যারা গুঞ্জা ফুলের মালা গেঁথে
পরে পরায় গলে,
যারা বৃন্দাবনের বনে
সদাই শ্যামের বাঁশি শোনে,
যারা যমুনাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে
শীতল কালো জলে..."[৫১]

কবিমনের অবচেতনায় বৈষ্ণবীয় প্রেমভক্তি অনুবর্ণিত হয়েছে এই সকল কবিতায়। বৈষ্ণবীয় ভক্তিরসের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকাশ। সচেতনভাবেই কবি পদাবলীর ভাবানুষঙ্গ এড়িয়ে না গিয়ে নিজস্ব Style এ তাঁর কাব্য কবিতার মধ্যে প্রকাশ করেছেন। একালের সমালোচক তাই মন্তব্য করেছেন—

"বৈষ্ণব কবিতার যে ভাবানুষঙ্গ, তাকে প্রত্যক্ষ প্রভাব না বলে কবিচেতনার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ বলাই ভাল।"[৫২]

'বীথিকা'র কয়েকটি কবিতায় বৈষ্ণব পদাবলীর ভাবানুষঙ্গ সুন্দর করে ধরা দেয়। রবীন্দ্রনাথ 'শ্যামলা' কবিতায় বাংলা প্রকৃতির শ্যামল কন্যার মধ্যে রাধার ভাবসাদৃশ্য দেখতে চেষ্টা করেছেন। কবি বঙ্গকন্যার রাধাবিরহের ভাব অনুভব করে বলে ওঠেন—

"ক্লান্ত-অশ্রু রাধিকার বিরহের স্মৃতির গভীরে

স্বপ্নময়ী যে যমুনা বহে ধীরে...”[৫৩]

বৈষ্ণব কবি জ্ঞান দাসের—

“রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয় গরজন
রিমিঝিমি শবদে বরিষে।”[৫৪]

কিংবা লোচন দাসের—

“চলে নীল সাড়ি নিঙ্গাড়ি নিঙ্গাড়ি
পরাণ সহিত মোর।”[৫৪]

‘শ্যামলী’র ‘স্বপ্ন’ কবিতায় এই পদগুলির নতুন তাৎপর্য দান করেছে। কারণ রাধিকার স্বপ্নকথা স্মরণ করে মুখচোরা, ‘কাজলপরা’ নীলশাড়ি নিঙাড়ি নিঙাড়ি চলা এক মেয়ের কথা মনে পড়ে যায় একালের কবির—

“রজনী শাঙন ঘন, ঘন দেয়া গরজন
স্বপন দেখিনু হেন কালে’
সে দিন রাধিকার ছবির পিছনে
কবির চোখের কাছে
কোন একটি মেয়ে ছিল,
ভালোবাসার কুঁড়ি ধরা তার মন।
মুখচোরা সেই মেয়ে,
চোখে কাজল পরা
ঘাটের থেকে নীল শাড়ি
‘নিঙাড়ি নিঙাড়ি’ চলা।”[৫৫]

এখানেই রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথই। বৈষ্ণব কাব্যকবিতার ছাঁচে রবীন্দ্রনাথের বহুকবিতা ও কাব্যের ধাঁচ গড়ে তুললেও নিজস্ব ত্রন্ধন্ডপ্তন্দ্ব বা শৈলীর যাদু তাঁর মধ্যে অবশ্যই ছিল। আর এই কারণেই রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি কর্মে বৈষ্ণব পদাবলী শৈলীর বিনির্মাণ ভাবনায় রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অদ্বিতীয়। এখানেই আধুনিক কবি রবীন্দ্রনাথ স্বতন্ত্র পথের পথিক।

তথ্যসূত্র :

১। চক্রবর্তী অজয় কুমার, ‘রবীন্দ্রসাহিত্যে বৈষ্ণব প্রভাব’, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি.লিট. গবেষণা গ্রন্থ, পৃঃ ১৩২
২। রবীন্দ্ররচনাবলী, ‘ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী’, পৃঃ ১৩৪
৩। মুখোপাধ্যায় হরেকৃষ্ণ (সম্পাদিত), ‘বৈষ্ণব পদাবলী’, গোবিন্দদাস, পৃঃ ৬৫২
৪। বৈষ্ণব পদাবলী, জয়দেব, ‘গীতগোবিন্দ’, পৃঃ ১১
৫। রবীন্দ্ররচনাবলী, ‘ভানুসিংহের পদাবলী’, পৃঃ ১৩৪
৬। তদেব, পৃঃ ১২৯
৭। বৈষ্ণব পদাবলী, বিদ্যাপতি, পৃঃ ১৩২
৮। রবীন্দ্ররচনাবলী, ‘ভানুসিংহের পদাবলী’, পৃঃ ১৩৩
৯। রায় বিশ্বনাথ, ‘ঐ’ পৃঃ ৩৭
১০। প্রশান্ত কুমার পাল, ‘রবিজীবনী ২য় খন্ড বিশ্বভারতী, পৃঃ ২৭৬
১১। দাসগুপ্ত শশিভূষণ, ‘বাংলা সাহিত্যে নবযুগ, পৃঃ ৭৩
১২। রবীন্দ্ররচনাবলী, ‘গীতাঞ্জলি’, পৃঃ ৭৮
১৩। ‘সোনার তরী’, ‘বৈষ্ণব’ কবিতা, পৃঃ ৩৬৭
১৪। দাস ক্ষুদিরাম, ‘বৈষ্ণব রস প্রকাশ’, পৃঃ ১৭২

১৫। রায় বিশ্বনাথ, ঐ, পৃঃ ৩৯
১৬। 'ঐ', কড়ি ও কোমল, মাথুরায়, পৃঃ ১৫৮
১৭। দাস জ্ঞান, পৃঃ ৪৪৪
১৮। 'কড়ি ও কোমল', 'বিরহ', পৃঃ ১৭৬
১৯। তদেব, 'বিলাপ', পৃঃ ১৭৮
২০। বৈষ্ণব পদাবলী, বিদ্যাপতি, পৃঃ ১২২
২১। ঐ, কড়ি ও কোমল, পৃঃ ১৫০
২২। বৈষ্ণব পদাবলী, জ্ঞানদাস, পৃঃ ৪১৫
২৩। 'কড়ি ও কোমল', পৃঃ ১৮৬
২৪। রায় বিশ্বনাথ, পৃঃ ৪৬
২৫। বৈষ্ণব পদাবলী, চণ্ডীদাস, পৃঃ ৪৩
২৬। রবীন্দ্র রচনাবলী, 'মানসী' 'পূর্বকালে' পৃঃ ৩১৮
২৭। তদেব, পৃঃ ৩১৯
২৮। বৈষ্ণব পদাবলী, চণ্ডীদাস, পৃঃ ৫৭
২৯। রবীন্দ্র রচনাবলী, পৃঃ ৩৩৬
৩০। তদেব, পৃঃ ১৩৩-১৩৪
৩১। রায় বিশ্বনাথ, পৃঃ ৪৭
৩২। রবীন্দ্র রচনাবলী, পৃঃ ৩৫৮-৩৫৯
৩৩। তদেব, পৃঃ ৪১০-৪১১
৩৪। সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৯৭
৩৫। বৈষ্ণব পদাবলী, চণ্ডীদাস, পৃঃ ৫৬
৩৬। রবীন্দ্র রচনাবলী, পৃঃ ৪১৩
৩৭। চক্রবর্তী অজয় কুমার, ঐ, পৃঃ ১৫২
৩৮। রবীন্দ্র রচনাবলী, 'সোনার তরী', 'বৈষ্ণব' কবিতা, পৃঃ ৩৬৭
৩৯। তদেব, পৃঃ ৩৬৮
৪০। কৃষ্ণদাস কবিরাজ, 'চৈতন্য চরিতামৃত', মধ্যলীলা, ২১ পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৪০৭
৪১। রবীন্দ্র রচনাবলী, পৃঃ ৩৬৮
৪২। তদেব, পৃঃ ৫০১
৪৩। বৈষ্ণব পদাবলী, চণ্ডীদাস, পৃঃ ১০৭২
৪৪। রবীন্দ্র রচনাবলী, পৃঃ ৫৬২
৪৫। বৈষ্ণব পদাবলী, জ্ঞানদাস, পৃঃ ৪১৩
৪৬। তদেব, দাস গোবিন্দ, পৃঃ ৬৯১
৪৭। তদেব, বংশীবদন, পৃঃ ২৭৬
৪৮। রবীন্দ্র রচনাবলী
৪৯। মুখোপাধ্যায় প্রভাত কুমার, 'রবীন্দ্রজীবনী' প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৪৫৮
৫০। রবীন্দ্র রচনাবলী, পৃঃ ৭২৬-৭২৭
৫১। রবীন্দ্র রচনাবলী, 'জন্মান্তর', পৃঃ ৭৯৬
৫২। রায় বিশ্বনাথ, ঐ। পৃঃ ৭১।
৫৩। রবীন্দ্র রচনাবলী, 'বিথীকা', পৃঃ ২৫৮
৫৪। বৈষ্ণব পদাবলী, জ্ঞানদাস, লোচনদাস, পৃঃ ৩৯১, ৪৮১
৫৫। রবীন্দ্র রচনাবলী, 'শ্যামলী', পৃঃ ৪১৭

*****